লোকোত্তর পুরুষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

মিতা মজুমদার

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের স্বনামধন্য লেখিকা

লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ কখনও কখনও বলতেন বিভিন্ন দেশের মানুষ কেমন তাঁকে আপন করে নিয়েছে সেসব কথা। বলতেন, ''শুনেছিলাম জার্মানরা নাকি খুব কঠোর। কিন্তু ওখানেও সবাই আমায় কত ভালবেসেছিল! কী কোমল প্রাণ ওদের। রাশিয়ানরাও যা ভালবাসে! ওখানে গেলে ছেলেরা জড়িয়ে ধরে। মীরা সালগানিক লিখেছে, 'এখানে চিকিৎসার জন্য আপনার আসা দরকার।' একবার অধ্যাপক সেরিব্রিয়ানি আর ওর বন্ধু আমার কাছে এসেছে। বন্ধুটি বলছে, 'We are bhaktas'। পকেট থেকে ঠাকুরের মলিন অস্পষ্ট ছোট একটি ছবি বের করে দেখাল। রাশিয়ার একজন নামকরা লোকসংগীত গায়িকা তার ঘরে Gospel দেখাল। একজন আবার বলল, 'ও আপনাকে গুরু মনে করে।' ''

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও বিবেকানন্দপ্রাণ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজ লোকেশ্বরানন্দজীকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁর কথা বলতে গিয়ে মহারাজ বললেন, ''আমি আবার কোনও কাজে 'না' বলি না, এগিয়ে যাই। একদিন উনি বলছেন, 'তামাক সাজতে জানিস?' আমি হারবার পাত্র নই। বললাম, 'হ্যাঁ'। উনি বললেন, 'সাজ তো দেখি!' সেজে দিয়েছি। উনি টান দিয়ে বলছেন, 'এঃ, হয়নি রে।' হবে কী করে? আসলে ঠিকরে বলে একটা জিনিস যে ওতে দিতে হয় তা তো জানতাম না, তাই দিইনি। আর একবার চা করতে বলেছেন। গরম জল করে পটে ঢালতে যাচ্ছি। উনি হাঁ হাঁ করে উঠেছেন, 'আরে, আগে পটটা গরম জলে ধুয়ে নে।' আদর করে বলতেন, 'তুই কিচ্ছু জানিস না।' একবার বললেন, 'গা-হাত-পা টিপতে জানিস?' বলেছি, 'হ্যাঁ জানি।' টিপে দিচ্ছি। উনি বললেন, 'এত আস্তে গা টেপা যায়? তুই কিচ্ছু পারিস না। দেখি তোর হাতটা।' দেখে বললেন, 'তোর হাতটা খুব নরম। খুব ভাল।' ''

এই 'ভালভাবে কাজ না করতে পারা'র জন্য মহারাজের মনে একটা দুঃখ ছিল। বলতেন, ''জানো, আমি কোনও কাজ জানতাম না। হাতের কাজ তো নয়ই। এখনও অবশ্য কোনও কাজই জানি

না। আসলে ছোটবেলায় মা, পিসিমারা আমাকে একবারে অপদার্থ করে রেখেছিলেন। মঠে এসে অবশ্য সবই করতে হয়েছে। বাসন মাজা, তরকারি কাটা, মাটি কোপানো, মোট বওয়া, পরিবেশন করা—সব। বেলুড় স্টেশন থেকে মাথায় করে আমের ঝুড়িও মঠে নিয়ে গেছি, আর এদিক থেকে ওদিক শুধু ধাক্কা খেয়েছি। তরকারি কাটতে গিয়ে আঙুল কেটে রক্তারক্তি কাণ্ড! ভাণ্ডারী মহারাজ দেখে বললেন, 'তোমাকে আলু কাটতে বলা হয়েছিল, আঙুল কাটতে বলা হয়নি।' পরিবেশন করতে গেলে হাত কাঁপত। কেন জানো? ভয়ে। কোনও সাধু বললেন, 'অল্প তরকারি দাও।' দিলাম। রেগে বললেন, 'অল্প দিতে বললাম না!' আর একজন সাধুকে দ্বিতীয়বার ভাত দিতে গেছি। বললেন, 'অল্প দাও।' দিলাম। বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হাঁড়িতে আর ভাত নেই নাকি?' অল্প দিলে কেউ বলতেন, 'আমি কি পাখি?' বেশি দিলে কেউ বলতেন, 'আমি কি গরু?' এইভাবে কত ধাক্কা যে খেয়েছি! কত কেঁদেছি, কত অভিমান করেছি!"

মহারাজ খুব গ্রহীষ্ণু ছিলেন। এইসব অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছু শিখেছেন। একান্ত ঘনিষ্ঠদের কাউকে কাউকে তিনি প্রায়ই বলতেন, ''কাজ করো, কাজ করো। ঠাকুর-মায়ের কাজ করে ধন্য হয়ে যাও। স্বামীজীর 'কর্মযোগ' ভাল করে পড়ো। জীবনটা একটা রুটিনে বেঁধে ফেলো। তাহলে অনেক কাজ করতে পারবে। কাজ করা ধ্যানজপের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। জপে বা ধ্যানে বসেছ, মন হয়তো এদিক-ওদিক ছুটছে; কিন্তু তাঁর কাজ করার সময় দেখবে মন একাগ্র থাকে।"

বস্তুত মহারাজ ছিলেন কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগের মহামিলনভূমি। তিনটি যোগই তাঁর জীবনে বড় সুন্দরভাবে সমন্বিত হয়েছিল। কর্মযোগী মহারাজ নিজের আমিত্ব সম্পূর্ণ মুছে ফেলে, ঠাকুরের হাতের যন্ত্র হয়ে কত বড় বড় কাজ করেছেন জীবনে। Intense activity amidst intense calmness (পরম প্রশান্তির মধ্যে প্রচণ্ড কর্মতৎপরতা)—এই ভাবটির শরীরী রূপ ছিলেন তিনি। শ্রীসারদা মঠের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষা পূজনীয়া শ্রদ্ধাপ্রাণামাতাজী আমাদের একদিন বলেছিলেন, ''১৯৮০ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বিতীয় কনভেনশনের সময় মহারাজ বিরাট এক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেটা জানতে পেরে ভাবলাম, দেখি তো এই সমস্যার মুখোমুখি হয়ে ওঁর মানসিক প্রশান্তি ও প্রসন্নতা অক্ষুণ্ণ আছে কী না! তা গেলাম। দেখা করলাম ওঁর সঙ্গে। দেখলাম মহারাজ ধীর, স্থির, শান্ত ও প্রসন্ন—একমনে কাজ করে চলেছেন। আবার পরম ভালবেসে, হাসিমুখে সকলের সঙ্গে কথাও বলছেন।"

পূজনীয়া মাতাজী আজীবন সেদিনের অভিজ্ঞতা মনে রেখেছিলেন। সারদা মঠে মায়ের মন্দিরের তলায় দাঁড়িয়ে সেই সন্ধ্যায় তিনি আমাদের বলেছিলেন, ''জানো, ওঁর পরমহংস অবস্থা। বিরাট শক্তি না থাকলে এ অসম্ভব!"

সম্ভবত সাতবার রাশিয়ায় গিয়েছেন মহারাজ। শুধু যে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন তা নয়। সেখানকার বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকেও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ, মা ও স্বামীজীর সর্বজনীন, উদার দিব্যভাবে ভাবিত করতে শুরু করেছিলেন। সেখানে আকাদেমি অব সায়েন্সেস ও রাইটার্স ইউনিয়ন—এই দুটি বিখ্যাত সংস্থা নানাভাবে মহারাজকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, বিপুল সংবর্ধনা দিয়েছেন। মস্কো থেকে ১৩ জুন একবার মহারাজ লিখেছিলেন, ''উৎসব চলছে। বড় বড় বিশপদের বক্তৃতা শুনলাম। শুধু খ্রিস্টধর্মের ও চার্চের জয়গান। অসার কথা। একদিনই শুধু বক্তৃতা। আমি [প্রেসিডেন্ট] Gromyko-র সঙ্গে দেখা করেছি। ধর্মের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। আমি 'বিবেকানন্দ সোসাইটি অফ মস্কো' করার চেষ্টায়

মিখাইল গরবাচভের সঙ্গে, ১৯৯৬

আছি। আজ ও ২০ জুন 'হাউস অফ ফ্রেন্ডশিপ'-এ বক্তৃতা। মাঝখানে কিয়েভ ঘুরে আসব। খুব আমোদ-প্রমোদ ও খানাপিনা হচ্ছে। ধর্মের নামগন্ধ নেই। আমি ২ জুলাই ইংল্যান্ডে যাব। আদরযত্ন প্রচুর, পরিশ্রমও প্রচুর। ভালবাসা জেনো।"

১৯৮৮ সালে মস্কোয় বেদান্ত সেন্টার স্থাপিত হওয়া মূলত তাঁরই সক্রিয় প্রয়াসের ফলশ্রুতি। বর্তমানে এটি রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্র।

১৯৮৮ সালের জুলাই মাসে মস্কো থেকে ইনস্টিটিউটে ফিরলেন মহারাজ। দুরাত ঘুম হয়নি, তাও মুখের হাসিটি অম্লান। মহারাজের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে আশ্রমিক ও ভক্তরা বিষণ্ণ। ম্লান ইনস্টিটিউট যেন আবার প্রাণ ফিরে পেল। চারিদিকে হইহই কাণ্ড। ক্লান্ত মহারাজ ঘরে না গিয়ে সোজা লাউঞ্জে এলেন। একজন ভক্ত সঙ্গে সঙ্গে মহারাজকে আজানুলম্বিত মালা পরিয়ে তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। মাঝে মাঝে টকটকে লাল গোলাপ দেওয়া রজনীগন্ধার মোটা গোড়ে মালা। মহারাজের মুখে সেই অমৃতবর্ষী হাসি। মালা পরালেন আরও একজন ভক্ত। ইতোমধ্যে ইনস্টিটিউটের একজন কর্মী মহারাজের উদ্দেশে লেখা একটি চিঠি পড়ে শোনালেন।

মহারাজের মুখ নিমেষে গম্ভীর হয়ে গেল। বললেন, ''চিঠিতে আমার প্রশস্তি করা হয়েছে। কিন্তু এ-কৃতিত্ব আমার নয়। সত্য বলছি, আমি স্বচক্ষে দেখলাম ঠাকুর, মা, স্বামীজী তাঁদের বিজয়রথে চড়ে নির্দিষ্ট আসনটিতে গিয়ে বসলেন। আমাকে দয়া করে সামনের রাস্তা ঝাঁট দেওয়ার অধিকার দিয়েছিলেন এবং তাতেই আমি ধন্য"—এই কথা বলে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ভাবে মুখ রক্তিম। দুচোখ বেয়ে অঝোরে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

মহারাজ তাঁর মহামূল্যবান কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলে একথার সত্যতা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। একবার রাশিয়ার বিখ্যাত হাউস অব ফ্রেন্ডশিপ-এ ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর বলার আগে সভাপতির অনুরোধে শুধু বলেছিলেন যে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সন্ন্যাসী। বক্তৃতার পর মহারাজকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য অনেকে ফুল নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, ''We are bhaktas"—''আমরা ভক্ত।" 'কার ভক্ত' জিজ্ঞাসা করাতে তাঁরা বললেন, ''রামকৃষ্ণের।" নীনা বলে একটি অল্পবয়সি মেয়ে এগিয়ে এসে মহারাজকে বলে, ''আমি রামকৃষ্ণের অনুগামী।" মহারাজ অবাক। জিজ্ঞাসা করলেন, ''শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি তুমি কোথায় দেখেছ?" কারণ, মহারাজ জানতেন ওখানে একমাত্র লেনিনেরই ছবি, তাঁরই মূর্তি। কোনও দেবদেবীর মূর্তি নেই। ''তিনি আমাকে কৃপা করে দর্শন দিয়েছেন"—একথা বলেই অঝোরে কাঁদতে লাগল মেয়েটি। মহারাজ বললেন, ''তুমি ভাগ্যবতী।" খুব ভালবাসতেন ওকে। একটি দ্বীপ থেকে একজন রাশিয়ান চিঠি লিখেছেন মহারাজকে, ''Ramakrishna's room -এ গিয়ে তোমার চিঠি, বই সব পেলাম।" মহারাজ একথা বলে বললেন, ''বুঝুন—রামকৃষ্ণের ঘর!"

মহারাজ আরও বললেন, ''ওদেশে আর একজন আমাকে বলল, সে চারবছর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছে। কী করে এটা সম্ভব বলতে পারি না, তবে এ তো ঘটছে! একে অস্বীকার করি কী করে? সম্প্রতি আমেরিকা থেকে একজন একটি ঘটনার কথা লিখছেন। স্বামী সৎপ্রকাশানন্দজী সেন্ট লুইস মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। এখন তাঁর শরীর চলে গেছে। অনেক বয়স হয়েছিল। একটি গোঁড়া ক্রিশ্চান মহিলা সারাজীবন তাঁর সেবা করেছেন। সেই মহিলাটি একবার স্বামী ব্রহ্মানন্দকে স্বপ্নে দর্শন করেছিলেন। রাজা মহারাজ স্বপ্নে তাঁকে বলেছিলেন, 'দেখো, আমার একজন সন্তান এখানে আসবে। তুমি তার সেবা কোরো।' সৎপ্রকাশানন্দ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের দীক্ষিত সন্তান ছিলেন। উনি পরে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু এই বৃদ্ধা ওঁর খুব সেবা করেছিলেন।''

একবার মস্কোয় 'বলশয়' থিয়েটারে মহারাজ গিয়েছেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী জেনে এক ভদ্রমহিলা মহারাজকে বলেন, ''আমি তো আপনার সঙ্গে এক আসনে বসতে পারি না, আপনার পায়ের তলায় আমার বসা উচিত।'' তাঁর বৃদ্ধ গুরুর সঙ্গেও মহারাজের আলাপ করিয়ে দিলেন মহিলাটি। জানা গেল তিনি বহুদিন আগে 'Gospel of Sri Ramakrishna' পড়েছিলেন। মার্শাল পোপভ নামে এক রাশিয়ান সৈনিক স্বামীজীর 'ভক্তিযোগ', 'রাজযোগ' প্রভৃতি রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করেন। আবার ইংরেজিতে অভেদানন্দজী অনূদিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-র কিছু অধ্যায়ও পোপভ রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করেন। সেই বই এখন আবার তাঁরা কুড়ি-পঁচিশজন মিলে লুকিয়ে লুকিয়ে সপ্তাহে একদিন করে পড়েন এবং ধ্যান করেন। এরকম অনেক ঘটনা তুলে ধরে মহারাজ বুঝিয়ে দিতেন যে ঠাকুরই কর্তা, তিনি অকর্তা, ঠাকুরের হাতের যন্ত্রমাত্র। ঠাকুরই তাঁর ভাবপ্রচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখেন।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট গ্রোমিকো সেবার 'ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ন' ঘোষণা করার পরদিনই মহারাজ 'Vivekananda Society of Moscow' তৈরির অনুরোধ জানালেন। মহারাজ বলছিলেন, ''ভাবতেই পারিনি যে উনি রাজি হবেন। কিন্তু উনি রাজি হলেন। হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলাম যে ঠাকুরই সব করালেন। আমি শুধু রাস্তা ঝাঁট দিয়েছি।''

'ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ন' ঘোষণার দিন রাশিয়ার জনসাধারণের সেই বাঁধভাঙা আনন্দের প্লাবনের সাক্ষী ছিলেন মহারাজ। ফিরে এসে ভক্তদের বলছিলেন, ''সে কী আনন্দ সবার! কতদিন পর আবার চার্চের সুমধুর ঘণ্টা বাজছে! লোকে লোকারণ্য! একটা দৃশ্য ভুলব না। এক বৃদ্ধা—তাঁর নাতনিই হবে সম্ভবত, কিন্তু সে পঙ্গু, তাকে নিয়ে ব্যাকুল হয়ে পাগলের মতো এগিয়ে আসতে চেষ্টা করছেন। সবাই তাঁকে পথ করে দিলেন। তিনি সামনে এসে এবার ব্যাকুলস্বরে প্রসাদ চাইলেন। পুরোহিত তাঁকে রুটি (যিশুর মাংসের প্রতীক) আর মদ (যিশুর রক্তের প্রতীক) প্রসাদ দিলেন।

''চার্চের পেছনে আন্ডারগ্রাউন্ডে একটা আধ মাইলটাক লম্বা গুহা আছে যা একটা নদীতে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেখানে জেদ করেই গেলাম। সন্ন্যাসীরা তপস্যা করে ওখানে দেহ রেখেছিলেন। তাঁদের পবিত্র দেহ কাচের আধারে রাখা আছে। দেখলাম সামান্য একটু কুঁচকে গেছে। অনেকের কিছু হাড়গোড় রাখা আছে। তাঁদের অনেকেরই পরিচয় অজানা। সবাই সেখানে প্রণাম করছে, আমিও প্রণাম করলাম। চার্চ প্রদক্ষিণ করলাম।

''বিবেকানন্দ সোসাইটিতে যোগ দেওয়ার জন্য অনেকে আসছে। ওরা সবাইকে নেবে না, শুধু যারা সিরিয়াস তাদের নেবে। ওদের কর্মসূচি অনেকটা ইনস্টিটিউট অব কালচারের মতো। রোম্যাঁ

রোল্যাঁর বইয়ের রাশিয়ান অনুবাদ ও আরও কয়েকটি বই বের করার কাজ প্রায় শেষ। সোসাইটির হেড চেলিশেভ আমায় খুব স্নেহ করেন।

''কিয়েভ শহরটা কী সুন্দর! ওখানে আমাকে সব জিজ্ঞাসা করছে, 'তুমি কোন চার্চের?' আসলে ওই উৎসবে আমি একাই হিন্দু ছিলাম। সবাইকে প্রথম প্রথম বলতে লাগলাম, 'আমি হিন্দু।' অনেকে তা শুনে প্রশ্ন করলেন, 'হিন্দুইজম এখনও আছে?' বললাম, 'শুধু আছে না, বহাল তবিয়তে আছে।' ওঁরা আমাকে কত ভালবাসতেন, কত খাবার-টাবার দিতেন। ফ্রিজে সব রাখতাম। লোকজন এলে তাদের বিলিয়ে দিতাম। চলে আসবার সময় তাঁদের কী দুঃখ! আবার আগামী মার্চে যাওয়ার কথা বলেছেন।

''রাশিয়ান সরকার স্কুলে ধর্মশিক্ষার অনুমতি দিলেন না। তবে চার্চ ধর্মশিক্ষা দিতে পারবে—এই অনুমতি দিলেন।''

১৯৯০ সালে রাশিয়া থেকে ফিরে এসে মহারাজ বললেন, ''রোয়েরিকের এস্টেট ওরা মঠকে দিয়ে দেবে। লেনিনগ্রাদ, যার নাম এখন সেন্ট পিটার্সবার্গ, সেখানেও রামকৃষ্ণ সোসাইটি হচ্ছে। লিথুয়ানিয়ায় স্টেট গেস্ট হয়ে ছিলাম। এয়ারপোর্টে নামার সময় থেকেই টিভির লোকেরা ক্যামেরা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। ওখানকার প্রেসিডেন্ট স্পেশ্যাল অনার দিলেন। পার্লামেন্টে ডিবেট বাদ দিয়ে আমার বক্তৃতা শুনলেন। নিজে শিল্পী, ভাল পিয়ানো বাজিয়ে শোনালেন। তবে আমি যাতে ভারতীয় পরিবেশটা পাই তাই একজন আমেরিকান ছেলে রবিশঙ্করের মতো পোশাক পরে একটু সেতার বাজাল আর তার স্ত্রী শাড়ি পরে তানপুরা বাজাল। আর একটি ছেলে তবলা বাজানোর ভঙ্গি করল। ভাবছি প্রেসিডেন্ট এত সুন্দর বাজালেন, ওঁকে কী দিই? তা পকেটে আমার ব্যবহার করা একটা পেন ছিল; বললাম, 'যদি কিছু মনে না করো, এইটে নেবে?' তিনি পেন নিয়ে প্রণাম করে পকেটে রাখলেন। তারপর শ্রুতি (একটি রাশিয়ান ভক্ত মহিলা) ওর ব্যাগ থেকে আমাকে ঠাকুর মা স্বামীজীর একটা ছবি দিল। সেটিও তাঁকে দিলাম।

''ওখানে একটি অনাথ আশ্রম আছে। যে-ভদ্রমহিলা আশ্রমটি দেখেন তাঁকে সবাই 'মাদার' বলে। খুব ভাল উনি। আমিও একসময় শিশুদের ওপর অনেক কিছু করেছি। কেউ জানে না। আমাকে তাই লন্ডনে সেই কনফারেন্সে ডেকেছিল। যেতে পারলাম না। ওরা বলল, 'আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ওপর ডকুমেন্টারি করব। আপনি থাকার ব্যবস্থা করে দিন। দিন পনেরো লাগবে।' বললাম, 'বেশ তো এসো। সব ব্যবস্থা করে দেব। তবে পনেরো দিনে হবে না। আরও বেশিদিন লাগবে।' মস্কোয় দুর্গাপূজা হবে এবার। ওখানে দুর্গাপুজোর ওপর বললাম। আমাকে দিয়ে ওপেনিং করাল। বললাম, 'দুর্গা হলেন মা। ঈশ্বর যেখানে, সেখানে সৌভাগ্য, সিদ্ধি, বিদ্যা, অর্থ সব। তাই মার সঙ্গে চারজন আসেন।' ''

ভাবগম্ভীর স্বরে মহারাজ এরপর বললেন, ''ঠাকুর ওখানে কতদিন আগে এসেছেন। সম্ভবত ১৯০৭ সালে অভেদানন্দজীকে মাস্টারমশাই গসপেল্-এর কিছু অংশ পাঠিয়ে বলেছিলেন, দেখো যদি ছাপতে পার। সেই লেখা পরে রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ হল। ঠাকুর নিজেই নিজের প্রচার করছেন। কত মানুষকে কত কৃপা করছেন। স্ট্যালিনের আমলে একটি চার্চকে রিফর্মেটারি করেছিল। স্ট্যালিন তো সব ধ্বংস করে দিয়েছিল। এখন সরকার সেই চার্চ ফিরিয়ে দিয়েছে। সবচেয়ে বড় সাধুর বয়স বাইশ। দেখলাম, ধর্মকে কিছুতেই চেপে রাখা যায় না।''

ক্রমশ